সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ: আকবর (1556-1605)

মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার অভিযানের সাফল্যকে নিশ্চিত করতে আকবর সামরিক আন্দোলন, প্রশাসনিক নীতিতে পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার গঠনের মত বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই পরিকল্পনার উদ্দ্যশ্য ছিল যাতে সমস্ত প্রজা বৈষম্য ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্য এবং সম্প্রীতি উপভোগ করতে পারে এবং একইসঙ্গে ভারতে মুঘল শাসন সুসংহত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।
(কুল্কে এবং রোথারমুন্ড, 2004)

প্রাথমিক সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার পরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আকবর মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। 1556 সালে পানীপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুর বিরুদ্ধে জয়লাভের পরে, আকবরের সৈন্যরা আরও দূরে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সাম্রাজ্যের বিস্তার পর্যায়ক্রমে ঘটে; প্রথম পর্যায় (1561-1576) ভারতের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বিস্তার ঘটেছিল; দ্বিতীয় পর্যায়ে (1583-1595) উত্তর ভারতের দিকে আকবর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন; এবং শেষ পর্যন্ত তৃতীয় স্তরে (1597-1601) মুঘল ক্ষমতা প্রসারিত হয়েছিল দাক্ষিণাত্যের দিকে। সম্প্রসারণের নীতি বলতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির সাথে দ্বন্দ্ব বোঝায়। এর মধ্যে কয়েকটি রাজনৈতিক শক্তি সুসংহত ছিল; রাজপুত রাজ্যগুলি প্রধানতঃ রাজশাসিত বা স্বায়ত্তশাসিত শক্তি হিসাবে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকলেও রাজপুতানায় তাদের অস্তিত্ব ছিল বেশি। আফগানরা মূলত গুজরাট, বিহার এবং বাংলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত। দাক্ষিণাত্যের এবং দাক্ষিণ ভারতে প্রধান রাজ্যগুলি হল খান্দেশ, আহমেদনগর, বিজাপুর, গোলকোন্ডা এবং অন্যান্য দক্ষিণী রাজ্য। উত্তর-পশ্চিমে কিছু উপজাতি তাদের ক্ষমতা বজায় রেখেছিল। কাবুল ও কান্দাহার যদিও মোগল গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, কিন্তু তারা আকবরের বিরোধিতা করেছিল

আকবর একটি নিয়মতান্ত্রিক নীতির মাধ্যমে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ শুরু করেছিলেন। এটি অবশ্যই লক্ষণীয় যে মোগল সাম্রাজ্যের বড় প্রসার ঘটেছিল আকবরের রাজত্বকালে। তাঁর উত্তরসূরিদের (জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেব) শাসনকালে সাম্রাজ্যের খুব সামান্যই সম্প্রসারিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে প্রধান সংযোজনগুলি হয়েছিল দক্ষিণ ভারত এবং উত্তর-পূর্বে (আসাম)।

উত্তর ও মধ্য ভারত: প্রথম অভিযানটি 1559-60 সালে গোয়ালিয়র এবং জৌনপুর দখল করতে প্রেরণ করা হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পরে রাম শাহ গোয়ালিয়র দুর্গ সমর্পণ করেছিলেন। খান জামানকে আফগান শাসিত জৌনপুরে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তিনি সহজেই আফগানদের পরাজিত করেন ও জৌনপুরকে মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করেন । মধ্য ভারতের মালওয়ার শাসক ছিলেন বাজ বাহাদুর। আধাম খান ও অন্যান্যরা মালওয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বাজ বাহাদুর পরাজিত হয়ে বুরহানপুরের দিকে পালিয়ে যান। মালওয়ার পতনের ফলে আরও এক হিন্দু রাজা রাজা অম্বর মুঘলদের দিকে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এরপরে, ১৫৬৪ সালে আকবর, দলপত শাহের বিধবা রানি দুর্গাবতীর দ্বারা শাসিত মধ্য ভারতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য, গড় কাটাঙ্গা বা গন্ডওয়ানা, জয় করেন। পরবর্তিকালে ১৫৬৭

সালে আকবর দলপত শাহের ভাই চন্দ্র শাহের হাতে রাজ্যটি হস্তান্তর করেন। গন্ডওয়ানা বিজয় আকবরের পক্ষে মেওয়ারের রাজধানী চিত্তোর জয়ের পথ মসৃণ করে। এর পূর্বে , আকবর সাফল্যের সাথে পাঞ্জাবের মির্জা খান, মালওয়ার আবদুল্লাহ খান উজবেগ এবং জৌনপুরের খান জামান উজবেগের বিদ্রোহ কে দমন করেছিলেন। এরপরে আকবর হিন্দু রাজপুত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চিত্তোরের দিকে যাত্রা করেন এবং এই রাজপুত রাজারা তাদের দুর্গ রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন

পশ্চিম ভারত: রাজপুতানার বিজয়: আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে একটি স্থিতিশীল সাম্রাজ্য গড়তে হলে তাকে অবশ্যই পার্শ্ববর্তী অঞ্চল রাজপুতানার রাজপুত রাজাদের অধীনে বৃহত অঞ্চলগুলি বশ করতে হবে। তিনি কেবল এই অঞ্চলগুলি জয় করার জন্যই নয় বরং তাদের শাসকদের মিত্র শক্তিতে পরিণত করার নীতি গঠন করেন। ১৫৬৮ সালে আকবরের সৈন্যবাহিনী চিত্তোর জয় করে, কিন্তু তারা রানাকে বন্দী করতে ব্যর্থ হন। রানা প্রতাপ মুঘলদের বিরুদ্ধে তাঁর গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন তার শেষ সময় পর্যন্ত। চিতোরের রানা প্রতাপকে বাদ দিয়ে আকবর সমস্ত রাজপুত রাজ্যের আনুগত্য লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি রণথমভোর জয় করার প্রয়াসে রাজস্থানে তাঁর সামরিক অভিযানকে আরও প্রসারিত করেন। দীর্ঘ এবং কঠিন অবরোধের পরে ১৫৬৯ সালে আকবর বুন্দির রাজা সুরজন হাদাকে পরাজিত করতে সফল হন। শহরটি মুঘলদের দ্বারা অধিকৃত হয় এবং রাজা সুরজন তার স্বাধীনতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। আকবরের চিতোর ও রণস্তম্ভরে অবরোধের ফলে রাজপুত সেনাবাহিনীর স্বাধীনতা প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়। কালিনজারের রাজা রামচন্দ্র ১৫৬৯ সালে স্বেচ্ছায় সম্রাটের কাছে সমর্পণ করেছিলেন

গুজরাটের বিজয়: মধ্য ভারত এবং রাজপুতানায় নিজের অবস্থান সুদৃঢ করার পরে আকবর ১৫৭২ সালে গুজরাটের দিকে যাত্রা করেছিলেন। হুমায়ুনের অপসারণের পরে গুজরাট আর ঐক্যবদ্ধ রাজ্য ছিল না।গুজরাটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন যুদ্ধ বিরোধী রাজ্য গড়ে উঠেছিল। কৃষির প্রয়োজনীয় উর্বর অঞ্চল ছাড়াও গুজরাটে প্রচুর ব্যস্ত বন্দর ছিল (ব্রোচ, ক্যাম্বে, সুরাট)এবং সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে গুজরাট ছিল প্রসিদ্ধ

সুলতান মুজাফফর শাহ নামমাত্র রাজা ছিলেন যার কর্তৃত্ব সাতটি যুদ্ধবাজ অঞ্চলের উপরে ছিল। রাজকুমার ইতিমাদ খান আকবরকে আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানালে আকবর নিজেই আহমেদাবাদে যাত্রা করলেন এবং কোনও গুরুতর প্রতিরোধ ছাড়াই শহরটি দখল করেন। শক্তিশালী দুর্গ থাকার ফলে সুরাট কিছুটা প্রতিরোধের দিতে সক্ষম হলে অবশেষে অধিকৃত hoy অল্প সময়ের মধ্যেই গুজরাটের বেশিরভাগ অঞ্চলই মুঘল অধিকারে চলে যায়। আকবর গুজরাটকে একটি সুবাহতে পরিণত করেন এবং মির্জা আজিজ কোকার শাসনাধীনে রেখে রাজধানীতে ফিরে আসেন। গুজরাতের পতন মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রেখেছিল এবং আকবরকে গুজরাট ভূখণ্ডের রাজস্ব পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ রাজস্ব বিভাগ স্থাপন করতে হয়েছিল। ছয় মাসের মধ্যেই বিভিন্ন বিদ্রোহী দল একত্রিত হয়ে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহের নেতারা ছিলেন ইখতিয়ার-উল-মুলক এবং মোহাম্মদ হোসেন মির্জা। মুঘল প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বেশ কয়েকটি অঞ্চল হস্তান্তর করতে হয়েছিল। খান জামান ও আসফ খানও বিদ্রোহ করেছিলেন। মুনিম খানের সহায়তায় আকবর তাদের দমন করতে সফল হন এবং মুঘল অবস্থানকে সুসংহত করেন

বৈরাম খানের বরখাস্তের পরে আভিজাতদের সাথে যে দীর্ঘ লড়াই শুরু হয়েছিল, এইসময় তার অবসান ঘটে। আকবর তার কূটনৈতিক দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং কিছু বিশ্বস্ত বন্ধুদের সহায়তার মাধ্যমে এই গুরুতর সঙ্কট মোকাবেলা করেছিলেন। আগ্রায় বিদ্রোহের খবর পেয়ে আকবর আহমেদাবাদে যাত্রা শুরু করলেন। তাঁর এই অভিযান অন্যতম কৃতিত্ব হিসাবে বিবেচিত হয়। আকবর একটি ছোট বাহিনী নিয়ে প্রতিদিন ৫০ মাইল গতিবেগে 10 দিনের মধ্যে গুজরাটে পৌঁছে বিদ্রোহকে দমন করেন। প্রায় এক দশক গুজরাটে শান্তি ছিল। ইতিমধ্যে, মোজাফফর বন্দীদশা থেকে পালিয়ে জুনাগড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। 1583 পরে তিনি কয়েকটি বিদ্রোহ সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন

পূর্ব ভারত: শেরশাহের কতৃক হুমায়ূনের পরাজয়ের পর থেকেই বঙ্গ ও বিহার আফগান নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৫৬৪ সালে, বিহারের গভর্নর সুলায়মান কররানী বাংলাকেও তাঁর অধীনে আনেন। সুলায়মান আকবরের ক্রমবর্ধমান শক্তি উপলব্ধি করেন এবং মোগলদের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেন। তিনি আকবরের নজরানা পাঠাতেন। 1572 সালে তার মৃত্যুর পরে,, তার ছোট পুত্র দাউদ সিংহাসন দখল করেন। দাউদ মুঘল আধিপত্যকে স্বীকার করতে অস্বীকার করেন এবং জৌনপুরের মুঘল গভর্নরের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। ১৫৭৪ সালে আকবর মুনিম খান খান-ই খানানের সাথে বিহারের দিকে যাত্রা করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই, হাজিপুর এবং পাটনা মুঘলদের দখলে চলে যায়; দাউদ গারির দিকে পলায়ন করেন। কিছুদিন থাকার পরে আকবর প্রত্যাবর্তন করেন। মুনিম খান ও রাজা টোডারমল দাউদএর পশ্চাতধাবন করেন। দাউদ মোঘলদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন আবার কিছুদিন পরে তিনি আবার বিদ্রোহ করলে শেষ পর্যন্ত খান-ই-জাহানের অধীনে মোগল বাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন ; গৌড় (বঙ্গ) মুঘল নিয়ন্ত্রনে চলে যায়। এটি প্রায় দুই শতাব্দী পরে 1576 সালে বাংলার স্বাধীন শাসনের অবসান ঘটে: দাউদ শাহকে বন্দী করা হয়। উড়িষ্যার কিছু অংশ তখনো কয়েকজন আফগান প্রধানের অধীনে ছিল। 1592 সালে মান সিং সমগ্র ওড়িশাকে মুঘল শাসনের অধীনে নিয়ে আসেন

1581 এর বিদ্রোহ: ভি. এ. স্মিথের মতে, "1581 সালটি আকবরের রাজত্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, যদি তার প্রথম দিকের ক্ষমতা সুদৃঢ়করনের সংগ্রামকে বিবেচনা না করা হয়।"
১৫৬৭ সালে আভিজাতদের বিরোধের সমাপ্তির পরে বাংলায় বিহার, গুজরাট এবং উত্তর-পশ্চিমে মারাত্মক কোন্দল দেখা যায়।। এর মূলে ছিল আফগানদের অসন্তোষ কারণ তারা মুগলদের দ্বারা সর্বত্র উৎখাত হয়েছিল। এ ছাড়াও, আকবরের জাগির পরিচালনার কঠোর প্রশাসনের নীতিও এর জন্য দায়ী ছিল। এই নতুন নীতি দ্বারা জায়গীরদাররা তাদের জাগীরের হিসাব জমা দিতে বলা হয় এবং তাদের জাগীরের আয়েরএকটি অংশ সামরিক ব্যয়ের জারি করা হয়। বাংলার গভর্নর এই বিধিগুলি নির্মমভাবে প্রয়োগ করেছিলেন যা বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিল। শীঘ্রই বিদ্রোহ বিহারে ছড়িয়ে পড়ে। মাসুম খান কাবুলি, রওশন বেগ, মির্জা শরফুদ্দিন এবং আরব বাহাদুর ছিলেন প্রধান নেতা বা বিদ্রোহী। মোজাফফর খান, রাই পুরসোত্তম এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী আধিকারিকরা এই বিদ্রোহ চূর্ণ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হন। আকবর তৎক্ষণাত রাজা টোডারমল এবং শেখ ফরিদ বক্সীর অধীনে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। আজিজ কোকা এবং শাহবাজ খানকেও টোডারমলকে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। এদিকে, বিদ্রোহীরা কাবুলে অবস্থানকারী আকবরের

ভাই হাকিম মির্জাকে, তাদের রাজা ঘোষণা করেছিলেন। মোঘল বাহিনী বিহার, বঙ্গ ও সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে বিদ্রোহ চূর্ণ করেছিল। কয়েকজন বিদ্রোহী নেতা পালিয়ে গিয়ে বাংলার বনাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং পরবর্তী বেশ কিছু বছর ছোট ছোট দল গঠন করে মুগল প্রাদেশিক সরকারকে হয়রানি করতে থাকে কিন্তু বিশেষ সাফল্য পায়নি

আকবরকে আরও বেশি চাপ দেওয়ার জন্য মির্জা হাকিম লাহোর আক্রমণ করেছিলেন। আকবর লাহোরের দিকে যাত্রা করেন। আকবরের মিছিলের সংবাদ শুনে হাকিম মির্জা তত্ক্ষণাত্ পিছু হটে যান। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে মোঘল আধিকারিকরা তাঁর সাথে যোগ দেবেন তবে তার সমস্ত হিসাব ব্যর্থ হয়েছিল আকবর উত্তর পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করার পরে, সৈন্য প্রেরণ করেন কাবুলে। তিনি নিজেও কাবুলের দিকে অগ্রসর হন। তিনি সেখানে পৌঁছানোর আগেই হাকিম মির্জা কাবুল ত্যাগ করেছিলেন; আকবর কাবুল দখল করেন এবং তার বোন বখত-উন-নিসা বেগমকে কাবুলের দায়িত্ব সমর্পণ করেন ও আগ্রার (1581) দিকে রওনা হন। কিছুদিন পরে, মির্জা হাকিম ফিরে এসে তার বোনের নামে শাসন চালিয়ে যান। মির্জা হাকিম চার বছর পরে মারা যান এবং রাজা মান সিং কাবুলের গভর্নর নিযুক্ত হন

বিহার, বাংলা এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলগুলিতে যখন বিদ্রোহ সংগঠিত হয় তখন প্রায় একই সময়ে গুজরাটেও বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল। এখানকাড় প্রাক্তন শাসক মোজাফফর শাহ বন্দীদশা থেকে পালিয়ে একটি ছোট বাহিনীকে সংগঠিত করেছিলেন। তিনি গুজরাটের মুঘল অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ শুরু করেছিলেন। ইতিমাদ খানকে গুজরাটের প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।বক্সী পদমর্যাদা ভুক্ত নিজামুদ্দিন আহমেদ তাকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় সহায়তা করেছিলেন। 1584 সালে মোজাফফর শাহ আহমেদাবাদ এবং নান্দেদে পরাজিত হন। তিনি পালিয়ে যান কচ্ছ অঞ্চলের দিকে। নিজামুদ্দিন আহমেদ তাকে অনুসরণ করেন। পুরো কচ্ছ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি দুর্গ তৈরি করে মোগল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল। মোজাফফর 1591-92 বন্দী হওয়া অবধি এই অঞ্চলে কিছুটা সমস্যার জিইয়ে রেখেছিল

উত্তর-পশ্চিমে বিজয়: হাকিম মির্জার মৃত্যুর পরে, কাবুলকে মুঘল সাম্রাজ্য ভুক্ত করা হয়েছিল এবং রাজা মান সিংকে জাগিরে হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। প্রায় একই সময়ে, আকবর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে বিভিন্ন বিদ্রোহ নিষ্পত্তি করতে এবং নতুন অঞ্চল জয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন

রোশানীদের দমন: **উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে** আকবরের দৃষ্টি প্রথমেই আকর্ষণ করে রোশানি আন্দোলন। রোশানী হল একজোন সৈন্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সম্প্রদায়, যাকে সীমান্ত অঞ্চলে সবাই পীর রোশন বলত। তাঁর অনুগামীর সংখ্যা ছিল বিশাল। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র জালাল এই সম্প্রদায়ের প্রধান হন। রোশানাইরা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং কাবুল ও হিন্দুস্তানের মধ্যবর্তী যোগাযোগের রাস্তাটি ধ্বংস করে দেয়। আকবর রোশনদের দমন ও অঞ্চলটিতে মোগল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য জাঈণ খানকে একটি শক্তিশালী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। সাইদ খান গাখর এবং রাজা বীরবলকেও জাঙ্গন খানকে সহায়তা করার জন্য পৃথক বাহিনী সহ প্রেরণ করা হয়েছিল। একটি অপারেশনে বীরবল তার বেশিরভাগ বাহিনীর সাথে নিহত হন (প্রায় ৮ হাজার)। পরবর্তীকালে, জাঈন খানও পরাজিত হন তবে তিনি আটকের

দুর্গে আকবর কাছে পৌঁছাতে পারেন। আকবর তার সবচেয়ে প্রিয় সহচর বীরবলের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হন। আকবর এই অঞ্চল দখলের জন্য রাজা টোডারমোলেরনেতৃত্বে এক শক্তিশালী বাহিনী নিযুক্ত করেছিলেন। রাজা মান সিংকেও এই অভিযানে সহায়তা করতে বলা হয়েছিল। দু'জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সাফল্য অর্জন করেছিল এবং রওশনারা পরাজিত হয়েছিল

কাশ্মীর বিজয়: দীর্ঘদিন ধরে আকবর কাশ্মীর জয় করার দিকে নজর রেখেছিলেন। অ্যাটকে শিবির স্থাপন করার সময়, তিনি রাজা ভগবান দাস এবং শাহ কুলি মহরমের অধীনে কাশ্মীর বিজয়ের জন্য একটি সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কাশ্মীরের রাজা ইউসুফ খান পরাজিত হয়েছিলেন এবং তিনি মুঘলদের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। তিনি কাশ্মীরকে যুক্ত করতে চেয়ে আকবর চুক্তিতে খুব বেশি সন্তুষ্ট হননি। ইউসুফের ছেলে ইয়াকুব কয়েকজন *আমিরের* সাথে মিলে মোগলদের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং যুদ্ধ শুরু হয়।কিন্তু শীঘ্র কাশ্মীরি বাহিনীর মধ্যে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে, মোঘলরা বিজয়ী হয় এবং 1586 সালে কাশ্মীরকে মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল

থাট্টার বিজয়: উত্তর-পশ্চিমের অন্য একটি অঞ্চল যা তখনও স্বাধীন ছিল তা হল সিন্ধুর থট্টা। আকবর খান-ই-খানানকে মুলতানের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন এবং ১৫৯৯ সালে তাকে সিন্ধু জয় করতে এবং বেলুচীদের পরাধীন করতে বলেন। থট্টাকে অধিকার করা হয়েছিল এবং মুলতানের গভর্নরের কর্তৃত্বাধীনে *সুবার সরকার* হিসাবে অভিষিক্ত হয়। মোগল বাহিনী সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে বেলুচিদের দমন চালিয়ে যায়। অবশেষে, 1595 সালে, সোয়াট, বাজৌর এবং বুনেরের মতো ধনী অঞ্চলগুলি জয় করে এবং বেলুচিস্তান এবং কান্দাহার অধিকার করার পরে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মুঘলদের সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়

দাক্ষিণাত্য এবং দক্ষিণ: উত্তর ভারতে তাঁর বিজয়ের পরে আকবর তার মনোযোগ দাক্ষিণাত্যে সরিয়ে নিয়েছিলেন যা অনেকগুলি ছোট ছোট এবং স্থানীয় রাজ্য স্থাপন করেছিল। দাক্ষিণাত্যে জয় করার অভিযান 1590 সালের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল এবং 1601 সাল পর্যন্ত জারি হয়েছিল। আকবর গুজরাট ও মালওয়া জয়ের পরে দাক্ষিণাত্যের আহমেদনগর, বিজাপুর এবং গোলকোন্ডা রাজ্য দখলে আগ্রহী হয়েছিলেন। পূর্বে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাষ্ট্রদূত বা নৈমিত্তিক পরিচিতিগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৫৯০ সালের পরে আকবর এই রাজ্যগুলিকে মুঘল নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পরিকল্পিত ভাবে দাক্ষিণাত্যে নীতি শুরু করেন। এই সময়ে,দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি অভ্যন্তরীণ কলহ এবং নিয়মিত দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়েছিল। 1591 সালে আকবর দাক্ষিণাত্যে মুগল সার্বভৌমত্ব গ্রহণের জন্য কয়েকটি কূটনৈতিক দৌত্য প্রেরণ করেন। ফয়জিকে আসির ও বুরহানপুর (খন্দেশ), খাজা আমিনউদ্দিনকে অহমদনগরে, মীর মোহাম্মদ আমিন মাশাদি বিজাপুরে, এবং মির্জা মাসুদকে গোলকুন্ডায় প্রেরণ করা হয়েছিল। 1593 এর মধ্যে সমস্ত মিশন বিফল হয়ে প্রত্যাবর্তন করে।কেবলমাত্র খন্দেশের অধিপতি আলী খানই মোগলদের দিকে অধীনতা স্বীকার করতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। আকবর দাক্ষিণাত্য রাজ্যগুলির প্রতি আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন

আকবর এই সময়ে নিজাম শাহীর নিয়ন্ত্রনাধীন কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যকে পরাজিত করেছিলেন; এর মধ্যে খন্দেশ, বেরার, আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকোন্ডা ও বিদার ছিল। 1591 সালে আকবর ভারতের একীকরণের উদ্দ্যেশ্যে দাক্ষিণাত্যের নেতাদের কাছে দূত

প্রেরণের উদ্যোগ নেন। তাঁর এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। বেশিরভাগ শাসক তাঁর আহ্বান উপেক্ষা করেন এবং মুঘাল আধিপত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ফলত, 1595 সালে, আকবর আহমেদনগরে তাঁর সৈন্য প্রেরণ করেন এবং সামরিক অভিযানটি সফল হয়; চাঁদ বিবি গুরুতর প্রতিরোধের পরে, বেরারকে সমর্পণ করতে সম্মত হন। চাঁদ বিবির এই ক্রিয়াকলাপ তাঁর প্রজাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং দাঙ্গার সৃষ্টি হয় । কিছুদিন পরে চাঁদ বিবি তা ফিরিয়ে নিতে বেরার আক্রমণ করেন। এবার নিজাম শাহী, কুতাব শাহী ও আদিল শাহী সেনাবাহিনী একটি যৌথ ফ্রন্ট উপস্থাপন করলেন। মোগলরা প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল তবে শেষ অবধি,১৬০০ সালে আকবর আহমদনগর এবং বেরার দখল করেন। ইতিমধ্যে ১৫৯৯ সালে খন্দেশের শাসক মীরান বাহাদুর শাহ ব্যক্তিগতভাবে আকবরের কাছ থেকে ব্যাক্তিগত সুরক্ষার নিশ্চয়তা পাওয়ার পরে, মুঘল ইউনিয়নে যোগদানের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে সম্মত হন। আকবর নিরবচ্ছিন্নভাবে খান্দেশ দখল করেছিলেন,কিন্তু পুত্র সেলিম অভ্যুত্থানের খবর পেয়ে তাকে শীঘ্রই আগ্রায় ফিরে যেতে হয়েছিল। আকবর অবশ্য দক্ষিন ও দাক্ষিণাত্যের ভূখণ্ডের প্রশাসনকে তিনটি প্রধান প্রদেশ/সুবাহ--আহমাদনগর, বেরার, খন্দেশে পুনর্বিন্যস্ত করেন। এই প্রদেশগুলি কে সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে আকবরের পুত্র ড্যানিয়েলের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল।মুঘল সাম্রাজ্যের মূলভূখণ্ডের মধ্যে আসিরগড়, বুরহানপুর, আহমেদনগর এবং বেরার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

প্রথম চার বছর বৈরাম খান তরুণ সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছিলেন। আভিজাতরা প্রত্যেককে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে বিভিন্ন মহলে বিভক্ত হয়ে গেছিল। আকবর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত অভিজাতদের নিয়ে একটি দল তৈরি করেছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ কেবল একটি ছোট্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। আকবর বিজয়ের নীতি শুরু করেছিলেন এবং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণের বিশাল অঞ্চলকে সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে এসেছিল, যদিও দক্ষিণে সাফল্য কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিজয়ের পাশাপাশি ঐকীকরণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছিল। ফলস্বরূপ, জয়যুক্ত অঞ্চলগুলি একীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে স্থাপন করা হয়েছিল। আকবরের তৈরি একীভূত সাম্রাজ্যকে তার উত্তরসূরিরা একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে বজায় রেখেছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে, দক্ষিণে (বিজাপুর, গোলকোন্ডা ইত্যাদি) এবং উত্তর-পূর্বে নতুন অঞ্চল যুক্ত হয়েছিল। মুঘল সম্রাটদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও ঐকীকরণে স্বায়ত্তশাসন প্রধানদের সাহায্য প্রাপ্তি।

আকবরের সাফল্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে মহান মুঘল শাসক হিসাবে স্বীকৃতি দেন যার কর্মকাণ্ড ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বদলে দেয়।একসময় প্রাদেশিকভাবে বা নির্দিষ্ট জাতি বা নৃগোষ্ঠীর শাসিত পুরো ভারতকে সফলভাবে ঐকীভূত করেছিলেন আকবর । তাঁর 50 বছর শাসনের সময় (1556-1605), মোগল সাম্রাজ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরব অর্জন করেছিল। রাজনৈতিকভাবে, মোঘলরা পারস্যের সাফাভিড এবং তুরস্কের অটোমানদের মত বিদেশী শক্তি দ্বারা স্বীকৃত ছিল। আকবরের পক্ষে এই স্বীকৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ ছিল ; এই স্বীকৃতির ফলে এই বিদেশি সরকারগুলির সাথে কূটনৈতিক এবং বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর হয়। তাঁর মৃত্যুর সময় মোঘল সাম্রাজ্য ১৫ টিরও বেশি অঞ্চল নিয়ে সংঘটিত ছিল জাড় মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সুবাহ আগ্রা, আজমির, এলাহাবাদ, আহমাদবাদ (গুজরাট) , বাংলা, বিহার,

দিল্লি, কাবিল, কাশ্মীর, লাহোর, মালওয়া, মুলতান, সিন্ধ, ওউধ সহ , বেরার, আহমদনগর এবং **খন্দেশ**□